রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা ও শ্রীনিকেতন

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।' রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন কাটিয়েছেন শহরে। জীবনস্মৃতি পড়লে দেখা যায় তিনি বাস করেছেন নিঃসঙ্গ ভাবের জগতে। সে জগতে মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার বাস্তবজীবন তেমন স্থান করে নেয়নি। তাঁর চিন্তা ও কল্পনা ছিল দার্শনিক প্রত্যয়সম্পন্ন, পল্লীমানুষের চিন্তা তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যে দেখা দেয়নি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি এসেছে বিপুল চলমান সৌন্দর্য নিয়ে। কখনো কখনো তিনি সমাজ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। যে-সমাজ আচার বিচার ধর্ম নিয়ে তাঁর কাছে নানা সমস্যা তুলে ধরেছে। পল্লীর মানুষ এল বেশ কিছুদিন পরে যখন তাঁর পিতৃদেব তাঁকে পাঠালেন জমিদারি দেখাশোনার ভার দিয়ে।

১৮৯০ সাল থেকে তাঁর উপর জমিদারি পর্যবেক্ষণের ভার এসে পড়ে। সেই উপলক্ষে পল্লীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়। তখন থেকে শুরু হল তাঁর সাহিত্যজীবনের নতুন পর্ব। গল্পগুচ্ছের গল্প থেকেই বোঝা যায় পল্লীর মানুষ এবং পল্লীর জীবন তাঁর মনকে কতখানি অধিকার করেছে। এই সময়ের লেখা কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' (মার্চ ১৮৯৫)। সৌন্দর্যক্লান্ত কবি বললেন,

এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

একথা কবি বলতে পেরেছিলেন বাংলার পল্লীর মানুষদের দিকে তাকিয়ে। তাদের জীবনের নানা সমস্যা, দুঃখ দারিদ্র্য অশিক্ষার অনড় অন্ধকার যেন এক নিমেষেই তাঁর কল্পনার এত দিনকার রঙীন স্বপ্নকে মুছে দিল। বাস্তবকে তিনি নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন, এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে পল্লীর ভাবনা আসন জুড়ে বসল। তাঁর এই পর্বের ভাবনা রূপ নিয়েছে গল্পগুচ্ছের গল্পে এবং ছিন্নপত্রের আত্মভাষণে। তাঁর সময়ের ভাবনার মধ্যে অভিযোগ অনুযোগের সুর ধ্বনিত হয়নি, যা ধ্বনিত হয়েছে তা তাঁর অসীম অনুরাগ এই মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি।

'আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।... এইজন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।'

ছিন্নপত্রের বিভিন্ন পত্রে কবির এই মমত্ববোধ ছড়িয়ে আছে। নিরন্ন শিক্ষাহীন সমস্যা কন্টকিত মানুষগুলির দিকে কবির গভীর অনুরাগ জেগে উঠেছে। তখনও কবি পল্লী মানুষের নানা সমস্যার মীমাংসা সন্ধান করতে আরম্ভ করেননি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বটি ছিল রসসৃষ্টির পর্ব। চৈতালির কবিতায় পল্লীজীবনের নানা খণ্ড ছবি ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে আছে কবির রসসৃষ্টির আনন্দ। দুঃখ দারিদ্র্যের ছবি ফুটেছে গল্পগুচ্ছের গল্পে। সেখানে মানুষের নানারূপ রচনা শিল্পীসুলভ কৌতূহল ও তৃপ্তি। প্রকৃতির প্রসারিত রূপেরই অঙ্গ যেন সেই সব মানুষের ঝগড়া কলহ, সাধারণ গ্রাম্য কৃষক, প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক, কন্যাভারগ্রস্ত পিতা, জমিদারের চক্রান্ত প্রভৃতি পল্লীজীবনের সমস্যার বহুবিধ পটভূমিতে গল্পগুচ্ছের জীবনচিত্রগুলি রচিত। কিন্তু কোথাও সমস্যার তীব্রতাকে কবি জ্বালাময় করে তোলেনি। গল্প রচনার সময় কবি গল্পটি রচনা করেছেন, কোনো সমস্যার প্রচার হিসাবে সেগুলি লেখা হয়নি।

জমিদারি দেখাশোনার ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে নতুন সৃষ্টির আনন্দ দেখা দিল। তেমনি পল্লীমানুষকেও আরো কাছের থেকে দেখলেন। প্রজারা নানা অভাব অভিযোগ নিয়েই তাঁর কাছেই আসত। জমিদার হিসাবে তাদের নানা ছোটখাট সমস্যার সমাধান তাঁকেই করতে হত। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব তথ্যগুলি তাঁর জানা হল। জমিদার - প্রজার সম্পর্কও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের পুরনো সাহিত্যে ও ইতিহাসে পল্লীসমাজ ও জীবন যে স্থান নিয়েছিল, নগর জীবনের ক্রমপ্রাধান্য তার সেই অধিকার হরণ করে চলেছে। গ্রামের জীবনের প্রাণশক্তি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে নগর জীবনের সভ্যতার সব দান সঞ্চিত হতে চলেছে। গ্রামের শিক্ষার ব্যবস্থা ক্ষয় পেয়ে এসেছে। আগে সমাজে শিক্ষার যে নীতি ও প্রণালী প্রচলিত ছিল, সে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষা এসেছে শহরে, গ্রামে তার আলো এসে পৌঁছয়নি। সমগ্র ভাবে সমাজের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ব্যবধান প্রায় দুস্তর হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে এই ব্যবধানটিকে স্পষ্ট করে তুললেন—

'এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনাপূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে। তারাই হল এনলাইটেনড,

আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজী পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধ তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, আকাল বলো জমে উঠল কাংস্য - বাক্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে নগরী হল সুজলা সুফলা, টানাপাখা - শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরাগ্য নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছবি আর কোনদিন চালানো হয়নি।

—শিক্ষার বিকিরণ।

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলছেন—

'আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে। তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে। বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার কুকুরের পঞ্জকস্তর। ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ বেয়ে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউটা দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।'

আধুনিক শিক্ষার আলো সবটাই গিয়ে পড়েছে শহরে। বিদ্যার প্রসার যা কিছু ঘটেছে শহরেই। সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যর ব্যবস্থা হয়েছে শহরে। গ্রামের মানুষ পূর্বতন শিক্ষার ব্যবস্থা হারিয়েছে— যাত্রা কথকতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আয়োজন ছিল পূর্বতন সমাজে, যখন সমাজই ছিল দেশের প্রধান শক্তি। ইংরেজ আসার পর শিক্ষাবিধির পরিবর্তন হয়েছে, আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শহরে। যে - সমাজ আমাদের জীবনধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করত, সে - সমাজের প্রতি মনোযোগ কমে গেল। চাকরি ব্যবসার স্থান হল শহরে। জমিদাররা প্রধানত শহরে এসে বাস করতে লাগলেন। গ্রামের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আর দৃষ্টি রইল না। শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদনের স্থল বলে গ্রামগুলিকে কোনক্রমে টিকিয়ে রাখা হল। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যজীবনের এই প্রচণ্ড বিপর্যয়ের ছবি বর্ণনা করেছিলেন। সেই আশ্চর্য জীবন্ত ছবির কিয়ংদশ উদ্ধৃত করছি। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয় গাঢ় রেখায় ফুটে উঠেছে—

'লোকহিতের কোনও উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনও বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না; আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে। তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই। ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি - তদন্ত-জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্যমূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা তাহাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশি ব্যাধিগুলো অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপথিরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি একসপ্লটেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই। পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট বসিয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।'

পল্লীজীবনের রূঢ় বাস্তব দিকগুলি বেশিদিন রবীন্দ্রনাথকে শিল্পের রসসৃষ্টিতে মাত্র বন্ধ হয়ে থাকতে দিল না। তিনি নিজে এ বিষয়ে যথাসম্ভব কাজ করতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তাঁর পিতা যে এ নিয়ে কতদূর কাজ করেছিলেন তা তিনি জানতে পারলেন আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগরি নিয়ে এসে। পুত্রকে তিনি কোনও লাভজনক কর্মে নিয়োজিত করতে পারতেন যাতে তাঁর পরিবারের আয় হয়। কিন্তু তা না করে রথীন্দ্রনাথকে লাগালেন শিলাইদহে হাতে কলমে কাজ করিয়া গ্রামের মানুষকে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলতে। আমাদের গ্রামে তখনকার দিনে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়নি, তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোনও খোঁজও কৃষকরা রাখত না। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিকে গ্রামে প্রচলিত করতে চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল যে বস্তুটির উপর সবচেয়ে জোর দিতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা। আমাদের শিক্ষাহীন গ্রাম্য মানুষদের সব চেয়ে বড়ো দুর্বলতা সেখানেই, যেখানে তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং তার ফলে পরনির্ভরশীলতা। সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাই তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী শস্য উৎপাদনে, কী অন্যায়ের প্রতিকার চিন্তায়, কী প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকাই ছিল তাদের নিয়তি। বিশ শতকের প্রথম দিকে তখন ইংরেজ রাজত্বের মধ্যাহ্ন। ইংরেজদের শোষণ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই ছিল না। তাদের কাছ থেকে সত্য সত্যই যে কিছু পাওয়ার নেই, সেটা তদের বুঝতে পারার কথা নয়। দাদাভাই নওরোজী কিংবা সখারাম গণেশ দেউসকরের বইয়ের খবর তারা রাখে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাখতেন। তাঁর শিক্ষিত বুদ্ধি স্বভাবতই বুঝতে পেরেছিল গ্রামের এই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলিকে অন্ধতার অন্ধকারে

রাখাই সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করার উপায়, সরকার মুখোপেক্ষী হয়ে তোলাই অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জমিদারিতে পল্লীর মানুষগুলিকে নিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা দেবার কথা ভেবেছিলেন। ইংরেজের কাছে দরবার করা বৃথা। পদে পদে রাজপুরুষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা আত্মাবমাননা। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি চর্চা করেননি— প্রজাদের মধ্যে তথাকথিত গণআন্দোলনও গড়ে তোলেননি। কিন্তু নিজে যথাযোগ্য কাজ শুরু করে দিয়ে পরনির্ভরশীলতা ঘোচানোর চষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেই প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের ব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। এক সময়ে প্রায় তিরিশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'বহগদেশের কৃষক' প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন, প্রজাদের মধ্যে বিচারের আশ্রয় কী রকম প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর্তভাবে সুযোগের অভাবে সুবিচার পাওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু এর ফলে নানা অন্যায় ও পীড়নে হতাশা ও ব্যর্থতা বোধ গ্রামের মানুষকে পঙ্গু করে ফেলেছে। এই মানসিক দীনতা থেকে মুক্তির পথ তৈরি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছিলেন সালিশী ব্যবস্থা। বিচারসভায় বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই উপস্থিত হয়ে গ্রামের মানুষদের দ্বারাই সালিশী নিষ্পন্ন করিয়ে নিত। এটা আসলে আমাদের দেশের বহু পুরনো রীতি। কিন্তু ইংরেজ এসে আমাদের পুরনো সমাজকে ভেঙে দিলে এই রীতিও অবলুপ্তির পথে চলে যায়।

আত্মনির্ভরশীলতার আর একটি দৃষ্টান্ত ছিল কালিগ্রাম পরগনার 'হিতৈষী সভা'। প্রজারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে সমিতি গঠন করেছে। এই সভাতেই গ্রামের উন্নয়মূলক নানা পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট স্থির করা হত। ইস্কুল ডিসপেনসারি প্রভৃতি নানা কাজের পরিকল্পনা দিয়েছে হিতৈষী সভা। শিক্ষা এবং চিকিৎসা এ দুটো ব্যবস্থা করা ছিল এর প্রধান কাজ। হিতৈষী সভার টাকা দিয়ে রাস্তা তৈরি করা, মজা ডোবা পুকুর উদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, কূপ খনন করা— এসব কাজও ছিল হিতৈষী সভার পরিকল্পনার অন্তর্গত।

পল্লীর একটি বড়ো বাস্তব সমস্যা হচ্ছে দু:স্থ গ্রামবাসীদের নিত্যস্থায়ী ঋণ। মহাজনের কাছে দেনার হাত থেকে তাদের মুক্তির পথ নেই। মহাজন এত চড়া সুদে টাকা ধার দেয় যে প্রজাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সুদ মিটিয়ে মূল দেনা শোধ করতে। খাটাবার জন্য টাকা অবশ্য দরকার। এই ঋণ দেয় মহাজন। কিন্তু সুদ মেটাতেই যদি টাকা চলে যায় তবে পরিবারের ভরণ-পোষণ করে মূল টাকা দেবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অল্প সুদে টাকা ধার দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন কৃষিব্যাঙ্ক। প্রথমে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাঙ্ক খোলা হল। পরে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের টাকাও এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলেন। এইভাবেই প্রজাদের একটা বড়ো সমস্যার সমাধানের পথ তিনি নির্দেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

''সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থায় উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না। দেখলুম - নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমনকি আট দশ মাইল দূরে গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পাঠশালা মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা মোকদ্দমা খুবই কম। যে অল্প স্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধূতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। গভর্ণমেন্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকেদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষীরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশাই, আমাদের আরও ট্রাকটর এনে দিলেন না'?''

—পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রায়ণ—২য় খণ্ড

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তাঁর মূল বক্তব্যই ছিল, আমাদের দেশে চিরকাল সমাজেরই প্রাধান্য ছিল, রাষ্ট্র ছিল অনেকটা দূরবর্তী। আমাদের জীবনধারণের নীতি, আদর্শ এবং প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ছিল সমাজের। ভগ্নপ্রায় সমাজকে পুনর্গঠিত করে স্বাবলম্বী করে তোলা তাই দরকার। পল্লীর মানুষদের তিনি কাছে পেয়েছিলেন, প্রজারা পেয়েছিল শুভৈষী জমিদারকে। স্বদেশী সমাজের প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, শহুরে বিদগ্ধজনকে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। তাঁর প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক উঠল কিন্তু কাজ কিছু বিশেষ হল না। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষদের মধ্যে স্বদেশী সমাজের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বহুকাল পর রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় যান (১৯৩০) তখন তিনি তাঁর কল্পিত আদর্শকেই নবরূপে এখানে দেখতে পেয়েছিলেন। রাশিয়ার তখন প্রজারাই রাষ্ট্রকে অধিকার করেছে। সেখানে সমাজ এবং রাষ্ট্র ছিল এক।

প্রজাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার একটি বড়ো দৃষ্টান্ত সমবায় নীতির প্রবর্তন সমবায় - সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম লেখেন ১৯১৮-১৯ সালে ভান্ডার পত্রিকায়। তখনও এ দেশে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়নি। কিন্তু শিলাইদহে - পতিসরে রবীন্দ্রনাথ সে - সংস্কার আরম্ভ করেছিলেন, সেখানে ছিল এর অঙ্কুর।

১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাকেন্দ্র। শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের কাছে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্ররূপে গঠিত। এখানে সংস্কৃতির উচ্চতর দিকগুলি নিয়ে গবেষণা ও চর্চা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে পল্লীর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বিশ্বভারতীর অনুশীলিত সংস্কৃতিতে নাগরিক সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। শ্রীনিকেতনে হয়েছে পল্লীসংগঠন, কৃষির উন্নতি, স্থানীয় গ্রামবাসীদের স্বাথ্য শিক্ষা

উন্নয়নের প্রয়াস। এতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সর্বাত্মক। বিশ্বমনস্ক কবি তাঁর নিজের হতশ্রী গ্রামের কথা ভোলেননি। একদা শিলাইদহ-পতিসরে তিনি গ্রামের উন্নতি বিধানের জন্য যে - কাজ আরম্ভ করেছিলেন, শ্রীনিকেতনে তিনি সেই কাজকেই সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণ রূপ দিতে চাইলেন। শ্রীনিকেতনকে শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন করার অভিপ্রায়টি অনুমান করা যায়। তিনি দেখেছিলেন গ্রাম ও নগরের বিচ্ছেদ আমাদের জাতীয় জীবনে কী দুর্গতি নিয়ে এসেছে। সুদূর শিলাইদহে বিচ্ছিন্নভাবে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা অসার্থক না হলেও অপূর্ণ। কেননা, নগরসভ্যতাকে তো তুচ্ছ করা যায় না। মানুষের সভ্যতা তো নগরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাবিরোধী ছিলেন না। গ্রামের উন্নতি চাওয়ার অর্থ নগরের প্রতি বিমুখ হওয়া নয়। যেটা প্রয়োজন সেটা এই যে, পল্লীকে উপবাসী রেখে নগর যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়। দেহের রক্তসঞ্চালন সমভাবে হওয়া চাই। পল্লীবাসীদেরও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ফল ভোগ করতে দেওয়া দরকার তাদের নিজস্ব জীবনধারা এবং উপযোগিতার সম্পূর্ণতা সাধন করবার জন্যই। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তিতে তাঁর চিন্তাধারা বোঝা যাবে।

'দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সংকুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে, মানুষের গ্রাস। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তা প্রকাশ হল এই মিলন থেকে— তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আযোজনপূর্ণ অনুষ্ঠান।

'আজ গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল— সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগতি নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির দ্বীপ জ্বলত, সে আজ লুপ্ত, ম্লান। শুধু যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো।

'এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্ট সাধনের শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা।

'প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকে সহযোগীরূপে চাই।

'বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। মানুষের শক্তির এই ন্যূনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।'

—১৯৩৪, ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতন উৎসবে ভাষণ।

বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সংগীতের সহযোগীরূপে পল্লী সেবার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের মানবিক ধারণাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

শ্রীনিকেতন স্থাপনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সবদিক থেকে উন্নতি সাধনে সহায়তা করা কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য সমাজ-সব দিক দিয়ে সংস্কারের আদর্শ স্থাপন করা এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে তার ফল পৌঁছে দেওয়া। শ্রীনিকেতনের ফার্মে পাটের চাষ শুরু হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারে প্রণালী প্রয়োগ করা হয় স্বাস্থ্যসমবায় প্রবর্তিত হল। রবীন্দ্রনাথ সহযোগীরূপে পেয়েছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ কয়েকজন ব্যক্তিকে। গ্রামশিল্পের বিশেষজ্ঞও তাঁরা। তাঁরা শ্রীনিকেতনে পরীক্ষা ও গবেষণায় সাহায্য করলেন। সংলগ্ন গ্রামবাসীরা তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ পেতেন।

শ্রীনিকেতনে পল্লীগবেষণার যে কেন্দ্র স্থাপিত হল তাতে স্থানীয় গ্রামের থেকে বৃত্তি দিয়ে শিক্ষানবিশ সংগ্রহ করা হত। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হল। এই কেন্দ্রে থেকেই শিক্ষানবিশরা শিক্ষা লাভ করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ছিল শিল্প শিক্ষা— চামড়ার কাজ, তাঁত, সূচের কাজ, মাটির কাজ, কাঠের কাজ, গালাশিল্প ইত্যাদি। এ-ছাড়া ছিল শিক্ষাসত্র যেখানে প্রাথমিক এবং ইস্কলের শিক্ষা দেওয়া হত। আর একটি বড়ো কাজের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— লোকশিক্ষা সংসদ। ঘরে বসে মোটামুটি বিদ্যাভাস করার ব্যবস্থা। গ্রামের মানুষের পক্ষে নিয়মিতভাবে ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে যথার্থ শিক্ষাই বুঝেছেন চাকরির শিক্ষা নয়। এইজন্য শিক্ষাকে যতখানি অন্তরের স্বাভাবিক বিষয় করে তোলা যায়, ততই মঙ্গল। বাংলায় নানা বিয়য়ের জ্ঞানের বস্তুকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার যে কল্পনা রবীন্দ্রনাথের ছিল— সেটা তাঁর দীর্ঘকালীন পল্লীচিন্তারই অঙ্গ। যারা শহরে পড়তে যেতে পারে না অথচ গ্রামে যথোপযুক্ত ইস্কুল নেই, তারা কেন আধুনিক জীবনের ভাবসম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, শ্রীনিকেতন একটা গতানুগতিক ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র নয়। যা শেখানো হয় তা অবশ্যই অভিনব কিছু নয়। শ্রীনিকেতনকে ইন্ডাসট্রিয়াল স্কুলের মতো ভাবলে চলবে না। শ্রীনিকেতন একটি স্রষ্টার স্বপ্নরূপ। তিনি শিক্ষাকে চেয়েছিলেন সজীব করে তুলতে। কাজটা যেন কৃত্রিম ক্লান্তিকর ভার মাত্র হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি তো দেখেছেন আমাদের গ্রামকে। দেখেছেন কি ভাবে অন্ন উৎপাদনের যান্ত্রিক নিরানন্দ কর্মে তারা লিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ কাজকে করে তুলতে চেয়েছেন আনন্দময়। যে আনন্দে শিল্পী রচনা করে, সেই আনন্দেই কৃষক যেন কৃষি কর্ম করে। প্রকৃতির মাতৃমূর্তি যেন সকলকে প্রাণোদ্দীপ্ত করে। শ্রীনিকেতন— এই নামটি তাই গভীর অর্থব্যঞ্জক। কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দৈনন্দিন কর্মকে পবিত্র করবে— এই ছিল কবির আকাঙ্ক্ষা।

সৌজন্য : পশ্চিমবঙ্গ-বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৪৪-৪৫, ১৯৮৫ (বানান অপরিবর্তিত)